উপসম্পাদকীয়

রাহুগ্রস্ত বিশ্ববিদ্যালয়

কাজী ফজলুর রহমান

একথা অবশ্যই মানতে হবে যে অযোগ্যতার অনুপ্রবেশ শুধু বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য শিক্ষাঙ্গনেই ঘটেনি— প্রশাসনে, রাজনীতিতে, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বত্রই একই ঘটনা কমবেশি ঘটেছে ও ঘটছে। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে অযোগ্যরা দেশের ক্ষতি যতটা করতে না পারে, তার চাইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এর অহিতকর প্রভাবও অনেক বেশি ফেলতে পারে। অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করতে পারে। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই তৈরি হচ্ছে ভবিষ্যতের শিক্ষক শুধু নয়, দেশের অন্য সকল ক্ষেত্রে যারা ভবিষ্যতে পরিচালকের আসনে বসবে তারাও।

(এক)

কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকায় মাঝে মাঝে আমাকে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ বোর্ডে বসতে হয়। শুরুতে সাধারণত প্রতিটি প্রার্থীকে একটি প্রশ্ন করা হয়—'কোন্ বছরে ডিগ্রি?' জবাব, '৯২-এর ব্যাচ, পরীক্ষা হয়েছে '৯৫তে, ফল বেরিয়েছে '৯৭তে।' ক্ষেত্রবিশেষে একটু হেরফের হলেও মোটামুটি বাস্তব এই যে দেশের প্রতিটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই একজন ছাত্রকে চার বছরের পড়া শেষ করতে সাত-আট বছর ব্যয় করতে হয়। অর্থাৎ তিন থেকে চারটি বছর—এমন একটা সময়ে যেটা এক হিসেবে জীবনের সর্বোত্তম কাল— জীবন থেকে খসে পড়ে, অপব্যয়িত হয়। শুধু এক একটি পরিবার নয়, সামগ্রিকভাবে সারা জাতি তাদের সম্ভাব্য অবদান থেকে বঞ্চিত হয়।

ঘটনাটি একেবারে নতুন নয়। ১৯৭৯ থেকে '৮১ পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ও পদাধিকার বলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলরের সচিব হিসেবে আমাকে এ ধরনের কয়েকটি ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, এমএতে একই সাফল্যের নিশ্চিত দাবিদার একটি ছেলে আমার সাথে দেখা করে সাহায্য চেয়েছিল। তার বক্তব্য পরীক্ষার এক বছর পরেও ফল বেরুচ্ছে না। তাই সে বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তির আবেদন, এমনকি ভর্তির দরখাস্তও করতে পারছে না। আমি অবশ্যই তাকে সহানুভূতি জানিয়ে ছিলাম, কিন্তু একই সাথে বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান; তার প্রশাসন বা শিক্ষকদের কিছু বলার অধিকার আমার বা বাইরের অন্য কারও নেই।

বিশ বছর আগে এই ধরনের ঘটনার হয়তো ব্যতিক্রম ছিল। কিন্তু আজ দেশের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এইটিই স্বাভাবিক, এইটিই নিয়ম। শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, সরকার এবং দেশের মানুষ যাদের অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলে সকলেই যেন এই পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েছে। ছাত্র, অভিভাবক ও দেশের মানুষ কেউ এটাকে কত বড় ক্ষতি, সেই বিষয়ে যেন সজাগ নয়। অথবা সজাগ হলেও তারা নিরুপায়। তারা হয়তো ধরে নিয়েছে যে এই পরিস্থিতির জন্য যারা দায়ী, কোন প্রতিবাদে তারা কান দেবে না, তাদের কিছু আসে যাবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হয়তো বলবে যে ছাত্রদের দলীয়-উপদলীয় হানাহানির ফলে প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয় অনির্ধারিতভাবে বন্ধ রাখতে হয়, তাই কোর্স সময়মতো শেষ হয় না। এটা হয়তো আংশিক সত্য। কিন্তু তার সাথে এও সত্য যে বেশকিছু শিক্ষকই ক্লাসে আসেন না, তাই কোর্সও শেষ হয় না। অনেক শিক্ষক মাসের পর মাস, এমন কি বছর ধরে পরীক্ষার খাতা ফেলে রাখেন—এই কাজের জন্য তাদের সময় নেই। তাই ফল প্রকাশ করা যায় না।

(দুই)

সম্প্রতি কিছু নীতিবান শিক্ষকের লেখা ও বক্তব্যেও অনেক শিক্ষকের এই প্রাথমিক ও ন্যূনতম দায়িত্ব পালনে অবহেলার কথা প্রকাশ পাচ্ছে। কেউ কন্‌সাল্‌টেন্সি করছেন—কাজের অবসরে নয়, পূর্ণকালীন ভিত্তিতে। কেউ কেউ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করছেন। কিছু দিন পূর্বে এক প্রবীণ শিক্ষকের মুখে শুনলাম যে এমনও শিক্ষক আছেন, যারা নিজের ক্লাসে উপস্থিত থাকার চাইতে বিভিন্ন কোচিং প্রতিষ্ঠানে পড়ানোকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন। ক্লাস না নিলেও, পরীক্ষার খাতা না দেখলেও তাদের কেউ কিছু বলে না, বলতে পারে না। এবং মোটামুটি বছর গুনে তাদের পদোন্নতিও ঠিকই হয়ে যাচ্ছে।

অবশ্য বিদেশেও শিক্ষকরা কনসালটেন্সি করেন। তবে তা করেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে, বাৎসরিক বন্ধের সময়ে। এটা তাদের মুখ্য পেশা হয় না। ক্লাসে আসবেন না, এটা অভাবনীয়।

প্রায় এক যুগ আগে পত্রিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীণ (তিনি আমারও শিক্ষক ছিলেন) শিক্ষকের নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি লেখা পড়েছিলাম। তিনি তার বিভাগের এক তরুণ শিক্ষক ঠিকমতো ক্লাস নেন না, এই জন্য মৃদু অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তার মুখের উপর জবাব দেয়া হয়েছিল, 'ক্লাস নিতে হবে এটা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের কোন্ ধারায় লেখা আছে?'

আমাদের বহু শিক্ষকই বিদেশের নামি-দামি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রীধারী। তারা অবশ্যই বাইরের অন্য কারও চাইতে অনেক ভাল করেই জানেন যে শিক্ষক নির্ধারিত ক্লাসে আসবেন না, পরীক্ষার খাতা না দেখে ফেলে রাখবেন, এই ধরনের ঘটনা অন্য কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে কল্পনাও করা যায় না। বহু দিন আগে ছাত্র ও দেড় বছরের শিক্ষকতার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেও বলতে পারি যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও এই ধরনের ঘটনা ছিল অচিন্তনীয়।

দিনের পর দিন বাংলাদেশ বহু ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে অনন্যতা অর্জন করে চলেছে। তার একটি অতি গৌরবের—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বাংলাদেশই প্রথম নতুন রাষ্ট্র যার প্রতিষ্ঠা হয়েছে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে একটি অত্যাচারিত অঞ্চলের জনগণের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে। কিন্তু তারপর বাকি সবকটাই বোধহয় গৌরবের না হয়ে লজ্জার।

'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'— কবির এই কথা আমাদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ ভালভাবেই প্রযোজ্য। পৃথিবীর আর কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে—

* চার বছরের পড়া শেষ করতে আট বছর ব্যয় করতে হয় না। অন্য কোন দেশ 'সেশন জট' শব্দটির সঙ্গে আদৌ পরিচিতি আছে কিনা সন্দেহ।

* প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রকাশ্য আনুকূল্যে সশস্ত্র ছাত্র ও অছাত্র অঙ্গদল ক্যাম্পাসে অবস্থান করে এবং বিভিন্ন ছাত্রাবাসের দখলদারিত্বে থাকে।

* জনসংখ্যার অনুপাতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হত্যাকাণ্ড ও অন্যান্য সহিংস ঘটনার হার অন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শুধু নয়, যেন কোন নগরীর 'ক্রাইম জোন'-এর চাইতেও বেশি।

* বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছাত্র নামধারী কিছু চাঁদাবাজ, টেন্ডার ব্যবসায়ীদের অভয়ারণ্য।

* ছাত্রাবাস পরিচালনায় অশিক্ষিত কিন্তু অস্ত্রশক্তিতে ও দলীয় সমর্থনে বলীয়ান টোকাই ও উচ্চশিক্ষিত প্রশাসন কর্মকর্তাদের মধ্যে 'শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান' সম্ভব হয়।

* বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্যের লড়াই হয় 'ধর্ষণকারী দল' আর 'হত্যাকারী দল'-এর মধ্যে। এই সংগ্রামে সরকারি প্রশাসন যন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যন্ত্র দুইয়েরই ভূমিকা মূলত দর্শকের।

* গড়ে প্রায় মাসে ন্যূনতম একটি করে নির্বাচনে প্রতিটি শিক্ষককে অংশ নিতে হয়।

* লাল, নীল, গোলাপি ইত্যাদি রামধনুর বহুবর্ণের ছোপে বর্ণিল দলে বিভক্ত শিক্ষকগণ এইসব নির্বাচনে ক্যানভাস করেন। পরস্পরের চরিত্র হনন করে লিফলেট বিলি করেন। ছাত্রনেতাদের সাহায্যপ্রার্থী হন।

(তিন)

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জবাবদিহিতার বিষয়টি আজকের নতুন নয়। আধুনিক অর্থনীতি বিজ্ঞানের জনক অ্যাডাম স্মিথ অক্সফোর্ড, গ্লাসগো ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছিলেন। প্রায় দু'শ বছর আগে তিনি লিখেছিলেন যে, তার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা নৈরাশ্যজনক কারণ সেখানে 'teachers' subsistence so far as it arises from salaries, is derived from a fund altogether independent of their success in teaching young man'. তার আশংকা ছিল 'money thrown of non-fee-paying education would disappear down the sink of the system in general contrived, not for the benefit students, but for the interest, or more properly speaking, for the ease, of the masters'. তার সুপারিশ ছিল, 'endowments to be replaced by payments specifically tied to the educational results achieved.'

অ্যাডাম স্মিথের দেশে তার প্রস্তাবিত সংস্কার পুরোপুরি না হলেও অনেকটা কার্যকর হয়েছে। বৃটেনে University Funding Council এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকারি অর্থের বরাদ্দ করে প্রত্যেকটি বিভাগের শিক্ষা ও গবেষণার মূল্যায়নের ভিত্তিতে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাঠামো মোটামুটি বৃটেনের অনুকরণেই তৈরি করা হয়েছিল। সে দেশে অভিজ্ঞতার আলোকে যেসব সংস্কার করা হয়েছে (বৃটেনে গণতন্ত্র চালু আছে এই কথাটি বোধহয় কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না) সেইগুলো কি আমরা গ্রহণ করতে পারি না?

(চার)

আজ সম্প্রতি একটি পত্রিকা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রকাশিতব্য (১৯৯৮)-এর বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে কিছু উদ্ধৃতি তাদের দিনের প্রধান সংবাদ করেছে। কমিশনের বক্তব্য হচ্ছে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা সম্পর্কে নীতিমালা থাকলেও তা মনে হচ্ছে না। শিক্ষকদের যোগ্যতা ও মান উন্নয়ন মূল্যায়ন না করে পদোন্নতি দানের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের জ্ঞান ও মর্যাদা ক্রমশই নিম্নগামী হচ্ছে।'

প্রতিবেদনে উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিম্নমুখী হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নির্বাচন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে গুণগত মান রক্ষার বিষয়টি গৌণ হয়ে পড়ে।'

মঞ্জুরি কমিশন এই কথাগুলো এখন বললেও নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে এই নীতি-বিচ্যুতির শুরু হয়েছে অনেক পূর্বে। মূলত এটি হয়েছে ও হচ্ছে দল-উপদলকে সন্তুষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে—বিভিন্ন নির্বাচনে ভোটদাতাদের সন্তুষ্ট রাখার প্রয়োজনে।

আমার হাতে সাম্প্রতিকতম পরিসংখ্যান নেই। তবে মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক বিলম্বে চিহ্নিত পরিস্থিতির বিষয়ে ধারণা পাওয়ার জন্য পুরানো হলেও নিম্নের পরিসংখ্যান যথেষ্ট। ১৯৮৪-'৮৫ ও ১৯৮৮-'৮৯-এর মধ্যে (অর্থাৎ চার বছরে)। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সর্বোচ্চ পদ 'প্রফেসার'-এর সংখ্যা বেড়েছিল শতকরা ৯৫ ভাগ, পরবর্তী পদ সহযোগী প্রফেসারের সংখ্যা বেড়েছিল শতকরা ১০৮ ভাগ, আর অন্যদিকে কমেছিল প্রায় আনুপাতিক হারেই সহকারী প্রফেসার ও প্রভাষকের সংখ্যা। পরবর্তীতে এই ধারা আরও জোরদার হয়েছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বর্তমানে অনেক বিভাগেই প্রায় সব শিক্ষকই 'প্রফেসার' অথবা ন্যূনপক্ষে 'সহযোগী প্রফেসার'।

স্মরণ রাখা উচিত যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যিকার অর্থে স্নাতকোত্তর গবেষণার কাজ অতি সীমাবদ্ধ। আমাদের মাস্টার্স ডিগ্রী বস্তুত স্নাতক শ্রেণীর অংশ—বিদেশে তাকে সেইভাবেই বিবেচনা করা হয়। মূলত স্নাতক শিক্ষাদানে নিয়োজিত পৃথিবীর আর কোন দেশে, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এত প্রফেসার আছে কিনা গবেষণার বিষয় হতে পারে।

যোগ্যতার অভাব নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোন বাধা নয়। অন্যদিকে কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মানের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ বা পদোন্নতি না হওয়ারও উদাহরণও আছে। আমার এক আত্মীয়া স্নাতক পরীক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগ ও ফ্যাকাল্টির মধ্যে সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করে কালী নারায়ণ বৃত্তি ও পদক লাভ করেছিল। তার বিভাগের চল্লিশ বছরের ইতিহাসে তার রেকর্ড মার্কস ছিল। পরবর্তীতে বিদেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্ব সহকারে মাস্টার্স করে দেশে ফিরে নিজের বিভাগে প্রভাষকের পদের জন্য দরখাস্ত করেছিল। কিন্তু তার আবেদন বিবেচনাও করা হয়নি। আমার পরিচিত সেই বিভাগের এক প্রবীণ শিক্ষককে এর রহস্য কি জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি দুঃখ করেই বলেছিলেন, 'আমরা আজকাল শিক্ষক রিক্রুট করি না, ভোটার রিক্রুট করি। বর্তমান চেয়ারম্যান নিশ্চিত নন যে এই প্রার্থী তার দলের হবে। তাই তিনি তার দরখাস্ত বিবেচনার জন্য বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটিতেই আনছেন না।' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে উল্লেখ প্রয়োজন যে ঘটনাটি দশ বছর আগেকার।

বহু বাঙালি শিক্ষক বিদেশের অনেক খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি সুনামের সাথে কাজ করছেন। ভারত, পাকিস্তান, চীন, কোরিয়া ইত্যাদি বহু এশীয় দেশেরও এমনি অনেক আছে। সেই সব দেশ জাতীয় নীতি হিসেবেই এই ধরনের জ্ঞানীগুণী শিক্ষকদের দেশে ফিরে আসার জন্য উৎসাহ দিচ্ছে, এমন কি অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাও করছে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ঠিক তার বিপরীত। কেউ ফিরে আসতে চাইলে তার ঠাঁই হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে যেসব কায়েমি স্বার্থের চক্র নিয়ন্ত্রণ করছে, তারা এটা চায় না।

একথা অবশ্যই মানতে হবে যে অযোগ্যতার অনুপ্রবেশ শুধু বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য শিক্ষাঙ্গনেই ঘটেনি— প্রশাসনে, রাজনীতিতে, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বত্রই একই ঘটনা কমবেশি ঘটেছে ও ঘটছে। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে অযোগ্যরা দেশের ক্ষতি যতটা করতে না পারে, তার চাইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এর অহিতকর প্রভাবও অনেক বেশি ফেলতে পারে। অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করতে পারে। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই তৈরি হচ্ছে ভবিষ্যতের শিক্ষক শুধু নয়, দেশের অন্য সকল ক্ষেত্রে যারা ভবিষ্যতে পরিচালকের আসনে বসবে তারাও।

(পাঁচ)

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র দুইয়ের মাঝেই বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের লোক থাকবে, তারা অন্যদের কাছে তাদের আদর্শ প্রচারের চেষ্টা করবে, এতে অন্যায় বা অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকার অবশ্যই গণতন্ত্রের ভিত্তি। কিন্তু সেই অধিকারের চর্চার মূল শর্ত হল তাতে যেন অন্যের অধিকার খর্ব না হয়, মতবিরোধের মীমাংসা যেন বন্দুকের গুলির মাধ্যমে না হয়, রাজনীতির চর্চা যেন অন্যায়ভাবে নিজের জন্য অর্থ, পদ, ক্ষমতা অর্জনের বাহন না হয়। গণতন্ত্রের নামে যেন সংখ্যা, অস্ত্র অথবা বহিশক্তির সাহায্যে বিরোধী পক্ষের বা ব্যক্তির উপর নিপীড়ন না হয়।

দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের নামে অন্যের অধিকার হরণ করাটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতির নামে লুণ্ঠন ও সন্ত্রাস চলছে। এক সময় শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসীদের পরিচিতি ও কর্মকাণ্ডে বাইরের সন্ত্রাসীদের থেকে কিছু দূরত্ব ছিল। এখন তাও লোপ পাওয়ার পথে।

একথা সত্য যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের বীজ বপনের 'কৃতিত্ব' ষাটের দশকে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের কুখ্যাত গভর্নর মোনেম খানের। কিন্তু প্রাক-স্বাধীনতা কালে দলমত নির্বিশেষে 'গণতান্ত্রিক' ও সামরিক সব শাসকদের সযত্ন জলসিঞ্চনে সেই বীজ এখন প্রশস্ত মহীরুহ। আর তার ডালে-পাতায়, ফাঁকে-ফোকরে অসংখ্য বিষধর সরীসৃপ ও হিংস্র শ্বাপদ নিরাপদ আশ্রয়ে আছে। দেশের সবকটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাস সংক্রমিত হয়েছে বিভিন্ন কলেজ ও অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

এমন অভিযোগও আছে যে শিক্ষকদের মধ্যে গ্রুপিং, দলাদলির প্রভাব কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্র বা ছাত্র নামধারী 'ক্যাডার'দের উপরে আছে। শিক্ষক ও প্রশাসন নিজেরা নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত হলে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার নৈতিক অধিকার হারায়। এখন স্বল্প কিছু শিক্ষক 'ক্যাডার'দের পৃষ্ঠপোষক হলেও, বেশির ভাগই তাদের কাছে 'জিম্মি'।

বহুদিন দেশের প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে সরকার যদি আন্তরিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাস দূর করতে চাইতো, তবে তা করতে পারতো। এই কথাটি গণতান্ত্রিক (যাকে 'সংসদীয়-একতান্ত্রিক' বলাই (বোধহয় সঙ্গত) বা নি...

SEP 15 1999